আদর্শ, উন্নয়ন ও দুর্নীতিঃ পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ *

বাংলাদেশে দুর্নীতির ভয়াবহ চিত্র

সাফল্যের সংবাদে কে না উল্লসিত হয় ! কিন্তু জাতীয় জীবনে এমন কিছু নেতিবাচক সাফল্য আসে যা জাতিকে বিষন্ন করে। আমাদের জাতীয় জীবনে সাফল্য সম্পর্কিত এমনতর একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষণ সংস্থা *টান্সপারেন্সী ইন্টারন্যাশনাল (টিআই)* এর সাম্প্রতিক রিপোর্টে। বিগত ১৮ই অক্টোবর, ০৫ বিশ্বব্যাপী প্রকাশিত 'দুর্নীতির ধারণা সূচক' *(সিপিআই)* এই প্রতিবেদনে পঞ্চম বারের মত বাংলাদেশকে বিশ্বে দুর্নীতির শীর্ষে অবস্থানকারী দেশ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে *(দৈনিক প্রথম আলো*, ১৯-১০-০৫)। চৌদ্দ কোটি মানুষের ললাটে দুর্নীতির কলঙ্ক তিলক এঁকে দেয়ার ক্ষেত্রে বিশ্বে প্রথম হতে পারার গ্লানি বড়ই বেদনাদায়ক! এক সাগর রক্তের বিনিময়ে বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছিল বহু ত্যাগ ও সংগ্রামের বিনিময়ে । এদেশে বিগত তিন দশকে আমাদের যা কিছু প্রশংসনীয় অর্জন–– খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা, জামানত ছাড়াই উন্নয়নমূলক ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচী বা গ্রামীণ ব্যাংক, ডাইরিয়া প্রতিরোধী ওর*সেলাইনের* আবিস্কার, শিশু মৃত্যুর হার কমানো, নারী শিক্ষা ও রপ্তানীমূখী তৈরী পোশাক শিল্পের প্রসার ইত্যাদি সবকিছুই যেন ম্লান করে দিয়েছে বিশ্বব্যাপী আমাদের এই কলঙ্কময় উপস্থাপনের মাধ্যমে। একবার নয়, পর পর পাঁচবার দুর্নীতিবাজ জাতি হিসাবে এই পরিচিতি, সারা বিশ্বে আমাদের ভাবমূর্তিকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে, হুমকির সম্মুখীন করেছে জাতীয় অস্তিত্বকে। বিগত ৯ই ডিসেম্বর, ২০০৫ *টিআই* কর্তৃক জাতিসংঘ ঘোষিত আন্তর্জাতিক দুর্নীতি বিরোধী দিবস উদ্‌যাপনের আলোচনায় বিষয়টাকে আরও স্পষ্ট করে তুলেছে। সমালোচিত হয়েছে জাতিসংঘ প্রণীত দুর্নীতি বিরোধী সনদে বাংলাদেশের সই না করার বিষয়টি । ডিসেম্বর মাসের ১৪তারিখ অনুসমর্থনকারী দেশসমূহে সনদটি কার্যকর করা হয়েছে।

তবে যে বিষয়টা একজন সচেতন নাগরিককে উদ্বিগ্ন করেছে সেটি হচ্ছে, বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশের এহেন লজ্জাস্কর ও বিপর্যস্ত চিত্র উম্মোচিত হবার পরও বিষয়টা পর্যালোচনার ব্যাপারে ক্ষমতাসীন সরকারের পক্ষ হতে কোন উদ্যোগ পরিলক্ষিত হলনা, বিরোধী দলের পক্ষ হতেও আসলনা সরকারের উপর চাপ সৃষ্টিকারী কোন প্রতিবাদী কর্মসূচী, গোল টেবিল আলোচনায় বসলেন না সুশীল সমজের বুদ্ধিজীবীগণ, এবং পালিত হলনা কোন মানব বন্ধন কর্মসূচী সামাজিক সংগঠন বা এনজিওদের পক্ষ হতে! আমরা জগৎবাসীর সামনে নব প্রজন্মের জন্য কি ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছি? আগামী প্রজন্মের জন্য আমরা কি এক অনিশ্চিত ও ভয়াবহ ভবিষ্যৎইনা রচনা করেছি!

*** ১৬ই এপ্রিল, ২০০৬ Center for Policy Studies (CPS), Dhaka কর্তৃক "দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ গঠনে সামাজিক আন্দোলন" শীর্ষক সেমিনারে উপস্থাপিত প্রবন্ধ।**

টিআই রিপোর্ট ছাড়াও কে না জানে বাংলাদেশের সরকারী প্রশাসন ব্যবস্থায় অব্যাহত দুর্নীতির কথা ? সরকারী অফিস-আদালত যেমন ভূমি প্রশাসন, *কাস্টমস* ও কর সংগ্রহ ব্যবস্থা, পুলিশ, বিদ্যুৎ ও টেলিফোন, সরকারী প্রকল্পে ঠিকাদার নিয়োগ এবং এমনকি, শিক্ষা বিভাগ ও *কোর্ট-কাচারির* সর্বত্রই চলছে দুর্নীতি ও স্বেচ্ছাচারিতার অপ্রতিরোধ্য দাপট! একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে বিশ্বব্যাঙ্কের উদ্যোগে পরিচালিত এক জনমত জরিপের উপর ভিত্তি করে রচিত, *"বাংলাদেশ ঃ ইমপ্রুভিং গভর্ণেন্স ফর রিডিউসিং পোভার্টি"* শীর্ষক প্রতিবেদনেও প্রশাসনে কর্তব্যবোধের অভাব, অদক্ষতা, দুর্নীতি, সরকারী সেবার নিম্নমান এবং এবং জনগণকে সেবা প্রদানের ব্যাপারে প্রশাসনের অমনোযোগ ইত্যাদির এক হতাশাব্যঞ্জক চিত্র ফুটে উঠেছে (বিস্তারিত দেখুন *প্রথম আলো*, ১০-০১-০৩)। অতি সম্প্রতি, *ডিসিসিআই*-এর উদ্যোগে "বাংলাদেশ ভিশন-২০২১" শীর্ষক কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনকালে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ অকপটে স্বীকার করেছেন যে, "দেশ বর্তমানে যে সমস্যাগুলো অতিক্রম করছে তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হলো দূর্বল প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা, *গভর্ণেন্স*, দুর্নীতি এবং অদক্ষতা" *(দৈনিক ইনকিলাব*, ২৬/০৯/০৬)। অথচ আমাদের সংবিধানের ২১(১)নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, সকল সময়ে জনগণের সেবা করিবার চেষ্টা করা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য। কিন্তু উল্লেখিত বাস্তব চিত্র সংবিধানে বর্ণিত প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণের [অনুচ্ছেদ ৭(১)] দুর্ভিসহ ভোগান্তি ছাড়াও প্রতি বৎসর দুর্নীতির কারণে সরকারের অপচয় হয় ১১,২৫৬ (এগার হাজার দুই শত ছাপ্পান্ন) কোটি টাকা (দেখুন *ট্রান্সপারেন্সী ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, দৈনিক যুগান্তর*, ২৩/০৯/০২ইং)।

সম্প্রতি প্রকাশিত *ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের* বিশ্ব প্রতিযোগিতা সক্ষমতা সমীক্ষায় দেখা যায়, বাংলাদেশে ব্যবসারত অধিকাংশ কোম্পানী মনে করে যে, দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের সক্ষমতার পরিবেশ উন্নয়নে দুর্নীতি প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছে *(দৈনিক ইত্তেফাক*, "বাংলাদেশে ঘুষ-দুর্নীতি বেড়েছে বিনিয়োগ সক্ষমতা কমেছে" ৩১/১০/০৩)। *টি.আই.*-এর অপর এক তথ্যানুসন্ধানী গবেষণা প্রতিবেদনে উল্লেখিত হয়েছে যে, স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে পেশকৃত ৭৭০ টি অডিট রিপোর্টের মধ্যে ৬২৯টি আলোচিত না হওয়ায় প্রায় ২২ (বাইশ) হাজার কোটি টাকার অডিট আপত্তি ঝুলে আছে *(দৈনিক প্রথম আলো*, ২২/০৯/০২) ! এছাড়াও দেশের রাজনীতি ও অর্থনীতিতে দুর্বিত্যায়নের কারণে বাংলাদেশ থেকে প্রতি বছর ৬০,০০০(ষাট হাজার) কোটি টাকা অবৈধভাবে বিদেশে পাচার হয়ে থাকে (গড়হবু খধঁহফবৎরহম) বলে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সভাপতি ড. আবুল বারাকাত এক গবেষণা সমীক্ষায় উল্লেখ করেছেন *(বিবিসি*, ২৬/০৯/০৩)। দুর্নীতি প্রতিরোধের মাধ্যমে এই বিপুল পরিমাণ অর্থ সাশ্রয় করা সম্ভব হলে, তা দিয়ে শিশু ও প্রসূতির চিকিৎসা, আর্থিকভাবে বিপর্যস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের মেরামত ও জনকল্যাণে ব্যয়ের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনে দেশটা যেমন অনেকদূর এগিয়ে যেত, তেমনি দাতাদের উপর আমাদের নির্ভরশীলতাও অনেকটা কমে আসত।

বাংলাদেশে দুর্নীতি সংক্রান্ত *টিআই রিপোর্টটি* প্রকাশিত হবার পর বেশ কিছু সমালোচনামূলক নিবন্ধ পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়াও উদ্বেগ প্রকাশ ও এর বিরুদ্ধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে সম্পাদকীয় লিখা হয়েছে প্রায় সবকটি জাতীয় দৈনিকে। কিন্তু সকল আলোচনায় অন্যের উপর দোষ চাপানোর প্রবণতা লক্ষ্যণীয়। কোন আলোচনায় জাতীয় জীবনের গভীরে প্রোথিত এহেন জাতীয় সমস্যার সমাধানের সুস্পষ্ট কোন দিক নির্দেশনা নেই! উল্লেখ্য যে, আমরা যখন দেশে দুর্নীতির ব্যাপারে পরস্পরের উপর দোষ চাপানোর বিতর্কে লিপ্ত, পাশ্চাত্য দুনিয়ায় তখন দুর্নীতি একটি পৃথক জ্ঞান প্রকল্প হিসেবে আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। তবে দেশের জনগণ বিশেষতঃ সুশীল সমাজের সবাই একথা স্বীকার করছেন যে, জাতির জীবনীশক্তি বিনাশকারী এই ভয়াবহ মহামারী হতে জাতিকে রক্ষা পেতে হলে একটি **সামাজিক আন্দোলনের প্রয়োজন।** দুর্নীতি প্রতিরোধের ব্যাপারে উপমহাদেশের ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায়, ১৭৭৫ সালে ভারতবর্ষের ইংরেজ গভর্ণর ওয়ারেন হেস্টিংস মীরজাফরের পত্নী মণি বেগমের কাছ হতে মাত্র দেড় লক্ষ টাকা উৎকোচ গ্রহনের বিনিময়ে তাঁকে মুর্শিদাবাদের নবাবের রক্ষণাবেক্ষণ কার্যে নিযুক্তি প্রদান করেছিলেন বলে, তৎকালীন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী উইলিয়াম পিট হেস্টিংসকে গভর্ণরের পদ হতে *ইম্পিচ* করেছিলেন। এরপরও কিন্তু ভারতবর্ষে কোম্পানীর সিভিল ও পুলিশ প্রশাসনের কর্মকর্তাদের মাঝে ঘুষ গ্রহণের প্রবণতা থেমে থাকেনি। এই ভয়াবহ ক্যান্সার থেকে সরকারী প্রশাসনকে রক্ষা করার জন্য পরবর্তীতে গভর্ণর জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংক ১৮২৮ খ্রীস্টাব্দে এক নতুন পন্থা অবলম্বন করেন। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সততা যাচাই করার জন্য তিনি উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের কাছ থেকে বার্ষিক গোপন প্রতিবেদন গ্রহণের নিয়ম প্রবর্তন করেন। সেই থেকে অদ্যাবধি সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বার্ষিক গোপন প্রতিবেদন (বা *এসিআর*) প্রণয়নের বিধান আমাদের দেশেও প্রচলিত আছে।

বৃটিশ হতে স্বাধীনতা লাভের পর, পাকিস্তান সরকার কর্তৃক ১৯৫৭ সালে প্রণীত এক আইনের বলে **দুর্নীতি দমন ব্যুরো** নামক এদেশে দুর্নীতি প্রতিরোধে একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে উঠে। কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে ন্যস্ত থাকার কারণে রাজনৈতিক প্রভাবাধীন অবস্থায় দুর্নীতি দমন ব্যুরো এর কার্যকারিতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলে। তাই দাবী উঠেছিল কার্যকরভাবে দুর্নীতি প্রতিরোধে দুর্নীতি দমন ব্যুরোকে স্বাধীন বা রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণমুক্ত করার। ক্ষমতাসীন সরকার অবশ্য দুর্নীতি সংক্রান্ত *টিআই রিপোর্টটি* প্রকাশিত হবার পূর্বেই নির্বাচনী অঙ্গীকারকে সামনে রেখে দেশে দুর্নীতি প্রতিরোধের লক্ষ্যে একটি **স্বাধীন দুর্নীতি দমন *কমিশন***গঠনের জন্য *দুর্নীতি দমন কমিশন আইন-২০০৪* শিরোনামে একটি বিল অষ্টম জাতীয় সংসদের নবম অধিবেশনে উপস্থাপন করে, যা সংশ্লিষ্ট সংসদীয় কমিটি কর্তৃক নিরীক্ষার পর সংসদের ১১তম অধিবেশনে পাস হয়। একই বছরে ফেব্রুয়ারী মাসে বিলটি রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভের মাধ্যমে আইনে পরিণত হয়। নয় মাস পর, ২০০৪ সালের নভেম্বর মাসে বিচারপতি সুলতান হোসেন খানকে চেয়ারম্যান এবং প্রফেসর ড. এম. মনিরুজ্জামান মিঞা ও জনাব মনির উদ্দিন আহমেদকে সদস্য করে তিন সদস্যবিশিষ্ট স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন গঠন করা হয়। এই কমিশনকে ঘিরে দাতা দেশ ও সংস্থাসমূহ এবং দেশের অভ্যন্তরে সুশীল সমাজের মাঝে প্রবল আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়েছিল। কিন্তু বিগত ২১শে নভেম্বর, ২০০৫ স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রথম বর্ষ পুর্তিতে দেখা যায়, কমিশন তার নিজস্ব সাংগঠনিক কাঠামো, জনবল সৃষ্টি, বিধি-বিধান প্রণয়ন ও কর্মকৌশল নির্ধারণ করে কাজই শুরু করতে পারেনি ! এই কমিশন গঠনের মাধ্যমে ক্ষমতাসীন নির্বাচিত সরকার দুর্নীতি প্রতিরোধে তার নির্বাচনী অঙ্গীকার পূরণ করেছে ঠিকই, কিন্তু কমিশনকে যথাযথভাবে কার্যকর করার জন্য আরও যে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজন ছিল, তা করা হয়েছে বলা যায় না। এজাতীয় হতাশাব্যঞ্জক পরিস্থিতিতে আগামীতেও যে দুর্নীতির অপ্রতিরোধ্য প্রসার ঘটবে, তা নিশ্চিতভাবে বলা যায়। অতএব, এজাতীয় উদ্যোগ ও পরিস্থিতিতে বাংলাদেশে অবস্থা পরিবর্তনের কোন লক্ষণ আপাতত পরিলক্ষিত হচ্ছেনা।

অতএব, ঘুরে ফিরে যে কথাটা স্পষ্ট হয়ে উঠছে সেটি হচ্ছে, দুর্নীতির মত জাতির অর্থনীতি ধংসকারী সরকারের দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের মনের গভীরে প্রোথিত একটি অভিনাসী ব্যাধি, আমাদের জাতীয় সমস্যা। এই সমস্যা সমাধানে একটি **সামাজিক আন্দোলনের** প্রয়োজন। একা সরকারের পক্ষে এর সমাধান সম্ভব নয় কেননা, জনগণের পক্ষ হতে সহযোগিতা না পেলে সরকারী কর্মকর্তারা দুর্নীতি করতে পারে না। অতএব, এই আন্দোলনে সরকার ও সুশীল সমাজের সম্মিলিত প্রয়াস অপরিহার্য। সমাজতত্ত্ববিদ, মনোবিজ্ঞানী ও ধর্মীয় বিশেষজ্ঞগণ এব্যাপারে পথনির্দেশনা দিতে পারেন।

দুর্নীতির অর্থনীতি

Oxford Advanced Learner's অভিধানমতে, দূর্নীতির অর্থ হচ্ছে অসততা বা অবৈধ আচরণ, বিশেষতঃ ক্ষমতা ও কতৃত্বে আসীন ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে ঘুষ গ্রহণের অভিযোগ। *টি.আই.*-এর সিপিআই (Corruption Perception Index) প্রতিবেদনও দুর্নীতিকে সরকারী ক্ষমতা ও সুবিধাকে বেসরকারী বা ব্যক্তিস্বার্থে অপব্যবহার অর্থে সরকারী কর্মকর্তা ও রাজনীতিবিদ্দের দুর্নীতিকে বোঝানো হয়েছে। দুর্নীতি প্রচলিত আইন ও মূল্যবোধের পরিপন্থী হলেও মানুষের মধ্যকার এই অশুভ প্রবণতা মানব ইতিহাসের সূচনালগ্ন হতে অব্যাহত। প্রাচীন ঐশীগ্রন্থ তওরাতে (Old Testament) উল্লেখিত হয়েছে যে, 'যদি তুমি অর্থ ছাড়, তাহলে দেখবে তা ম্যাজিকের মত ফল দেবে! অবশ্য পরবর্তী বাক্যে সতর্ক করে বলা হয়েছে, অবশ্যই এজাতীয় কর্মকে উৎসাহিত করা অনুচিত হবে'। প্রাচীন ভারতের ধ্রুপদী সাহিত্য চানক্যের *অর্থশাস্ত্রে* রাজ অমাত্যদের (মন্ত্রী ও উচ্চ পদস্থ সরকারী আমলা) মাঝে দুর্নীতির উল্লেখ পাওয়া যায়।

দুর্নীতি মানুষের *ফিত্‌রাত* বা স্বভাবের মধ্যে গ্রন্থীত। ঐশী গ্রন্থ *আল-কুরআনে* মানুষের সৃষ্টিকারী আল্লাহ্ বলেনঃ "*ওয়া উখদিরাতিল আন্‌ফুছুশশুহহা*" অর্থাৎ স্বার্থপরতা মানুষের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট (*সুরা নিসা*, ৪ঃ ১২৮)। মানুষের মাঝে এজাতীয় প্রবণতাকে ঈমাম গাজ্জালী Satanic propensity বলে অভিহিত করেছেন। যতদিন মানুষের মাঝে এই প্রবণতা নিয়ন্ত্রণমুক্ত থাকবে, ততদিন সমাজে দুর্নীতিও অব্যাহত থাকবে। পৃথিবীতে এমন কোন দেশ বা সমাজ নেই, যা সম্পূর্ণ দুর্নীতিমুক্ত। এজন্য আল্লাহ্ ও তাঁর রসুল (সঃ) মানুষকে জ্ঞানের চর্চা ও পূণ্য কর্মের মাধ্যমে পরিশুদ্ধ হবার তাগিদ দিয়েছেন।

দুর্নীতি আধুনিক বস্তুবাদী সভ্যতার একটি অবিনাশযোগ্য প্রবণতায় পরিণত হয়েছে। ঘুষ দুর্নীতির কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের খরচ গড়ে শতকরা দশ ভাগ বেড়ে যায় বলে অর্থনীতিবিদ্দের ধারণা। এব্যাপারে বিশ্বব্যাংকের মন্তব্য হচ্ছে, "Bribery has became a $1 trillion industry" অর্থাৎ বর্তমান বিশ্বে ঘুষ এক হাজার কোটি ডলারের শিল্পে পরিণত হয়েছে। ফলে Revisionist School বলে একদল অর্থনীতিবিদ্ দুর্নীতির

ইতিবাচক দিকগুলো বিশ্লেষণপূর্বক একে উন্নয়নের সহায়ক বলে এক ধরনের তত্ত্ব উপস্থাপনে সচেষ্ট হয়েছেন। তাদের মতে, দুর্নীতি শুধু প্রশাসনের চাকাকেই গতিশীল করেনা, দুর্নীতির মাধ্যমে সমাজের কিছু লোকের হাতে পুঁজি সঞ্চিত (Capital accumulation) হয়। পুঁজি সঞ্চালন হচ্ছে উন্নয়নের পূর্বশর্ত। এই সঞ্চিত পুঁজি বিনিয়োগের মাধ্যমে সমাজে সম্পদ ও চাকুরী সৃষ্টি হয় এবং এথেকে পুনঃসঞ্চয় ও বিনিয়োগ––এই চক্রাকারে দুর্নীতি অর্থনীতিতে গতি সঞ্চালিত করে (দেখুন N.H. Left,"Economic Development Through Bureaucratic Corruption" and J.S. Nye,"Corruption and Political Development: A Cost-Benefit Analysis", in Arnold J. Heidenheimer (ed.) *Political Corruption* (New York : Holt Reinhart and Wilson, ১৯৭০)। কিন্তু বাংলাদেশে দুর্নীতির অভিজ্ঞতা Revisionist-দের তত্ত্বকেও ভ্রান্ত প্রমাণিত করেছে। এদেশে দুর্নীতির মাধ্যমে যাদের হাতে অর্থ পুঞ্জিভূত হয়েছে, তা অর্থনীতিতে বিনিয়োগ নয় বরং মাত্রাতিরিক্ত ভোগ, অপচয় ও বিদেশে পাচার এবং অবৈধ ও সমাজ বিরোধী কর্মকান্ডে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বাংলাদেশের মত দুর্নীতিপরায়ণ ও সীমিত সম্পদের জনবহুল দেশে, দুর্নীতির বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিরোধ যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন দ্রুত অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন––আর এসবের জন্য অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে একটি **প্রেরণাদায়ী আদর্শের**।

আদর্শ ও উন্নয়ন

ঘুরে ফিরে যে কথাটা উঠে আসছে সেটি হচ্ছে, রাজনীতি ও প্রশাসনের গভীরে প্রোথিত দুর্নীতির মত জাতির জীবনীশক্তি ধংসকারী একটি ব্যাধি আমাদের জাতীয় সমস্যা। এর সমাধানে একটি জোরদার **সামাজিক আন্দোলনের** প্রয়োজন। যে কোন গোষ্ঠীবদ্ধ বা সামাজিক আন্দোলন সফল হতে হলে প্রয়োজন একটি উজ্জীবনী চেতনা বা **আদর্শিক প্রেরণা**। কি হবে আমাদের সেই প্রেরণা ? এটি সমাজতত্ত্ববিদ্ ও মনোবিজ্ঞানীদের গবেষণার বিষয়। প্রখ্যাত আচরণবিদ্ ও মনোবিজ্ঞানী ঝরমসঁহফ খৎবঁফ এর মতে, মানুষ তার আচার আচরণে অনেক সময় অবচেতন মনে অনুভূতি ও আবেগের দ্বারা প্রভাবিত হয়। মানুষের আদর্শগত অনুভূতি ও উন্নয়নের মধ্যকার কারণগত সম্পর্কের ব্যাপারে দু'একটি ঐতিহাসিক উদাহরণ নিম্নে তুলে ধরা হলে।

নমুনা এক, বিগত শতাব্দীর প্রথমদিকে মার্কসীয় দর্শনের জোরালো প্রচারে ধর্মকে দরিদ্র শ্রেণীর আফিমের সাথে তুলনা করা হয়েছিল এবং বলা হচ্ছিল যে, ধর্ম হচ্ছে ধনীদের শোষণের হাতিয়ার ! এমনতর এক বৈরী পরিবেশে প্রখ্যাত জার্মান সমাজতত্ত্ববিদ গধী ডবনবৎ ধর্ম ও উন্নয়নের মধ্যকার সম্পর্ক বিষয়ে সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী এক বক্তব্য উপস্থাপন করেছিলেন। তাঁর *The Protestant Ethics and the Spirit of Capitalism* (১৯৬৫) নামক গ্রন্থে। সারা বিশ্বে আলোড়নসৃষ্টিকারী এই গ্রন্থে ওয়েবার দেখিয়েছেন যে, ষোড়শ শতাব্দীর ধর্ম বিপ্লবের পরবর্তী সময়, হতে অর্থনৈতিকভাবে উন্নত দেশগুলি হচ্ছে *প্রোটেস্ট্যান্ট* ধর্মাবলম্বী দেশ যেমন ইংল্যান্ড, জার্মানী ও আমেরিকা। অপরদিকে, রোমান *ক্যাথলিক* ধর্মাবলম্বী দেশগুলি অর্থনৈতিক দিক হতে অনেক পশ্চাতে। এর কারণ হিসাবে ওয়েবার বলেন, *প্রটেস্ট্যান্টদের* উন্নতি লাভের কারণ হচ্ছে, এই ধর্মে কঠোর পরিশ্রম, মিতব্যয়, সঞ্চয় এবং বাণিজ্যের মাধ্যমে উপার্জন ইত্যাদিকে ধর্মীয় কর্তব্য (Religions calling) হিসাবে উৎসাহিত করা হয়েছে। অপরদিকে, *ক্যাথলিক* ধর্মে পার্থিব জীবনের উপর কমগুরুত্ব দিয়ে শুধু পরলৌকিক কল্যাণে ব্রতী হবার আহ্বান রয়েছে। Max Weber ধর্ম ও অর্থনীতির মধ্যকার সম্পর্ক প্রমাণে *The Sociology of Religion* (১৯৬৩) নামক অপর এক গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে, বৃটিশ ভারতে মুসলিম সম্প্রদায় গরীব কেননা, মুসলিমদের ধর্মগ্রন্থ *কুরআনে* রিবা বা সুদ-কে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। একারনে সুদ ব্যবসার মাধ্যমে ভারতীয় মুসলমানদের হাতে পুঁজি সঞ্চিত হতে পারেনি। অপরদিকে, ভারতীয় শেঠ্রা সূদ ব্যবসার মাধ্যমে প্রভূত পুঁজির অধিকারী হয়েছিল যাদের কাছ হতে বৃটিশ সরকারকেও ঋণ গ্রহণ করতে হত।

নমুনা দুই, আধুনিক খ্রিস্টান বিশ্বের প্রায় চারশত কোটি মানুষের মধ্যে একজনও পড়া-লেখা জানেনা এমন অশিক্ষিত নেই। কারণ খ্রিস্টান পরিবারের একজন বালক বা বালিকা যখন বার বৎসর বয়সে পদার্পণ করে, তখন তাকে *চার্চে* নিয়ে যাওয়া হয় *ব্যাপটাইজ* করার জন্য। বালক বা বালিকাটির মাথায় হাত রেখে চার্চের পাদ্রী যীশুর বাণী শুনিয়ে বলেন, 'অশিক্ষিত থাকা পাপ'। এই পাপ মুক্তির জন্য ধর্মীয় চেতনা নিয়ে লেখা-পড়া করে বলে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে কেউ অশিক্ষিত থাকেনা। আজকের বিশ্বে শিক্ষা-দীক্ষায় খ্রিস্টানদের উন্নয়নের পেছনে এই ধর্মীয় প্রেরণাই হয়েছে বড় নিয়ামক শক্তি।

নমুনা তিন, Farrel Heady নামক এক গবেষক পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সরকারী শাসন ব্যবস্থার তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে *Public Administration : A Comparative Perspective* (১৯৮৪) শীর্ষক একটি গবেষণা গ্রন্থ রচনা করেন। হিডি তার তুলনামূলক লোক-প্রশাসন সমীক্ষায় *সিভিল সার্ভিস* প্রশিক্ষণে ধর্মীয় শিক্ষার কতিপয় ইতিবাচক ফলাফল তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে, ইউরোপের সুইজারল্যান্ডের আমলারা খ্রিস্টান ধর্মের শিক্ষা (বিশেষতঃ *প্রটেস্ট্যান্ট* দর্শন) দ্বারা প্রভাবিত বলে, সততা ও কর্তব্যনিষ্ঠার প্রতি অধিকতর সচেতন। অপরদিকে, চাইনিজ সরকারী কর্মকর্তারা *কনফুসিয়াস* দর্শন দ্বারা প্রভাবিত বলে, জনগণের সাথে মিথস্ক্রিয়ায় সদাচরনের ব্যাপারে অধিকতর মনোযোগী। পাশাপাশি, প্রতিবৎসর প্রকাশিত **'বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের'** *বার্ষিক রিপোর্টে* ১ম ও ২য় শ্রেণীর সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে শতকরা গড়ে ৮০ (আশি) জনের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ সম্পর্কিত এক হতাশাব্যঞ্জক চিত্র ফুটে উঠে! কেন এরূপ হয়? বিভিন্ন জরিপ প্রতিবেদনেও নৈতিকতার নীচু মানকে বাংলাদেশে সরকারী প্রশাসনের অব্যবস্থা ও অদক্ষতার জন্য দায়ী করা হয়েছে। এর প্রধান কারণ হচ্ছে, ধর্ম নিরপেক্ষ বাংলাদেশের রাজনীতিবিদ্ ও সরকারী কর্মকর্তারা তাদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে কোন আদর্শ বা ধর্মদর্শন দ্বারা উজ্জীবিত হয়না বলে, তাদের পেশাগত বিশ্বদর্শন (Professional Worldview) অস্পষ্ট। ফলে তারা সহজেই স্বার্থের তাড়নায় দুর্নীতিতে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন।

নমুনা চারঃ ইসলামের আবির্ভাবকালে আরবের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ছিল মূলতঃ সূদ ভিত্তিক। ধনী ও দরিদ্রের ব্যবধান এত প্রকট ছিল যে, ধনীরা যখন তাদের খাবারের উচ্ছিষ্ট দূরে ছুঁড়ে মারত, তখন তা গ্রহণের জন্য বুভুক্ষ মানুষ ও কুকুরের মধ্যে রীতিমত কাড়াকাড়ি শুরু হত। রোমান *গ্ল্যাডিয়েটর্সদের* মল্লযুদ্ধের ন্যায় সেই বীভৎস দৃশ্য ধনীরা উপভোগ করত। এহেন পরিস্থিতিতে *আদল* (ন্যায়বিচার) ও *এহসান* (কল্যাণ) ভিত্তিক সমাজ গঠনে *কুরআনের* আয়াত নাজিল হলঃ "... *তোমাদের মধ্যে যাহারা বিত্তবান কেবল তাহাদের মধ্যেই যেন সম্পদ আবর্তিত না হয়*" (*সুরা হাশ্‌র*, ৫৯ঃ৭)। এর বাস্তবায়নে 'সূদ'-কে হারাম করা হল এবং পরকল্যাণ বা *জাকাত* প্রদানকে *ঈমানের* অন্যতম মৌলিক ভিত্তি হিসাবে ঘোষণা করা হল। এই আদর্শিক ব্যবস্থাপনায় সমাজ এমনভাবে পরিবর্তিত হয়ে গেল যে, মাত্র চার দশক সময়ের মধ্যে আরবের বাইরেও ইসলামী সমাজে সূদখোর কেউ রইলনা। আবার *জাকাত* গ্রহনের মত কাউকে খুঁজে পাওয়া গেলনা (খলিফা ওমর ইব্‌নে আবদুল আজীজের শাসন আমলে)।

নমুনা পাঁচ, সপ্তম শতাব্দীতে মদিনা রাষ্টের সরকার প্রধান হিসাবে মহানবী (সঃ) বনু জারয়ান গোত্রের আব্দুল্লাহ বিন লাইতাইকে একবার জনগণের কাছ হতে *জাকাতের* অর্থ আদায়ের জন্য *আমীল* (রাজস্ব সংগ্রহকারী) নিয়োগ করেছিলেন। আদায়কৃত *জাকাত* সামগ্রী রসুল (সঃ) -এর দরবারে জমা দেবার সময় আব্দুল্লাহ সেগুলিকে দু'ভাগে ভাগ করে বললেন, "ইয়া রসুলুল্লাহ (সঃ)' ! এর এক ভাগ হল জনগণের কাছ হতে আদায়কৃত অর্থ, আর বাকী একভাগ লোকেরা আমাকে উপহার হিসাবে দিয়েছে"। একথা শুনে রসুল (সঃ) বলেছিলেন, "তুমি সরকারী কর আদায়ের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত না হয়ে যদি বাড়ীতে বসে থাকতে, তাহলে কি লোকেরা তোমাকে এসব উপহার দিত"? একথা বলে নবী করিম (সঃ) সমস্ত উপহার সামগ্রী *জাকাতের* সাথে বায়তুলমালে (সরকারী কোষাগারে) জমা করার নির্দেশ দেন এবং পরদিন সমাবেশ ডেকে সরকারী কর্মকর্তাদের জন্য জনগণের কাছ থেকে উপহার গ্রহণ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন (*সহিহ মুসলিম*)। এরই সাথে সংযুক্ত হয়েছে রসুল (সঃ) এর একটি সতর্ককারী *হাদীস*, "কাউকে কোন দায়িত্বে নিয়োগ করা হলে তাকে আমরা বেতন-ভাতা দেব। এর পর তিনি যদি কিছু উপরি গ্রহণ করেন, তাহলে সেটা বিশ্বাস ভঙ্গের (Breach of trust) কাজ" (আবু দাউদ)। উল্লেখ্য যে, অন্যায়ভাবে ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে বিচারক ও প্রশাসকদেরকে ঘুষ প্রদানের বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারিত হয়েছে পবিত্র *কুরআনে* (*সুরা বাকারা*, ২: ১৮৮; এবং *সুরা মায়িদা*, ৫: ৬৩)। এব্যাপারে সংশ্লিষ্ট অপর হাদীসটি হচ্ছে, "ঘুষখোর, ঘুষদাতা আর দু'জনের মধ্যে সংযোগ রক্ষাকারী সবাই সমপর্যায়ের গুনাহ্‌গার" *(আহলে সুনান)*। অপর এক ঘটনায় মহানবী (সঃ) একদা বাজার পরিদর্শনকালে লক্ষ্য করেন যে, জনৈক ব্যবসায়ী জনগণকে প্রতারণার মাধ্যমে অধিক মুনাফা লাভের প্রত্যাশায় শুকনা গমের ভেতর ভেজা শস্য লুকিয়ে বিক্রির চেষ্টা করছে। এজাতীয় অনৈতিক আচরণের জন্য তিনি ব্যবসায়ীকে কঠোর বাক্যে ভর্ৎসনা করেছিলেন। উপরোল্লিখিত ঘটনা ও মহানবী (সঃ) এর শিক্ষা, দুর্নীতির প্রবণতার বিরুদ্ধে মানুষের মনে অভ্যন্তরীণ প্রতিবন্ধকতা (Internal check) হিসাবে কাজ করেছে। পরবর্তীকালে মদিনার বাইরেও ইসলামী রাষ্ট্রের বিস্তৃতিলাভের কারণে, সরকারী প্রশাসনে জনস্বার্থ সংরক্ষণ ও নাগরিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা হিসাবে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বাহ্যিক নিয়ন্ত্রক (External control) প্রতিষ্ঠান প্রবর্তিত হয়। এর একটি হচ্ছে, সরকারী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহার ও স্বেচ্ছাচারিতা সম্পর্কিত অভিযোগ শ্রবণ, তদন্ত ও দ্রুত প্রতিকার বিধানের জন্য ***দিওয়ান-ই-মাজালিম*** (সরকারী প্রশাসকদের বিরুদ্ধে জনগণের অভিযোগ তদন্তকারী প্রতিষ্ঠান) ; এবং অপরটি হচ্ছে, অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে

অসাধুতা রোধ এবং ব্যক্তি ও সমাজের জন্য ক্ষতিকর তৎপরতা প্রতিরোধক এবং ধর্মীয় ও নৈতিক বিধান প্রতিপালন তদারকি প্রতিষ্ঠান ***আল-হিস্‌বা*** (বাজার পরিদর্শক) [বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন লেখকের "লোক-প্রশাসনে লোক জবাবদিহিতা ঃ আধুনিক ও ইসলামী পদ্ধতি", *জার্ণাল অব ইসলামিক এডমিনিস্ট্রেশন*, ভল্যুম-৫ (১৯৯৯)]।

কথিত আছে যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরুতে, রাশিয়ার সাথে এক দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার কারণে সুইডেনের রাজা দ্বাদশ চার্লস (King Charles-XII) তুরস্কে নির্বাসন যাপন করেন। দীর্ঘ বার বৎসরকাল তুরস্কে অবস্থানকালে অটোমান সম্রাজ্যের বিভিন্নস্থানে সেসময়ে সক্রিয় *দিওয়ান-ই-মাজালিম* (অভিযোগ তদন্তকারী) এবং *আল-হিস্‌বা* (বাজার পরিদর্শক) প্রতিষ্ঠান দু'টি রাজা চার্লসের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষন করে। রাশিয়ার সাথে যুদ্ধ শেষে দেশে ফিরে রাজা দ্বাদশ চার্লস রাজ কর্মচারীদের আইন বিরোধী আচরণের বিরুদ্ধে জনসাধারণের রক্ষাকবচ হিসাবে ইসলামের আইনগত ও প্রাতিষ্ঠানিক রক্ষাব্যবস্থার আদলে, Justitie Ombudsman (JO) এবং ক্রেতা সাধারণের স্বার্থ রক্ষার জন্য Consumer Ombudsman (CO) নামে দু'টি প্রতিষ্ঠান প্রবর্তন করেন। এই সুইডিস *অম্‌বুড্‌জ্‌ম্যান-ই* পরবর্তীকালে প্রশাসনিক স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে নাগরিকদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা হিসাবে বিশ্বব্যাপী সম্প্রসারিত হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানেও আইনসভা কর্তৃক *অম্‌বুডজ্যাঅম্যান* প্রতিষ্ঠার কথা বলা আছে (৭৭ নং অনুচ্ছেদ)। কিন্তু আজ অবধি নাগরিক প্রতিরক্ষামূলক সংবিধানে উল্লেখিত ধারাটি কার্যকর করা হয় নাই। [বাংলাদেশে *অম্‌বুড্‌জ্‌ম্যান* বা ন্যায়পাল প্রতিষ্ঠা ও এর ভূমিকার ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন আবদুন নূর, *প্রশাসনিক স্বেচ্ছাচারিতা প্রতিরোধে অম্‌বুড্‌জ্‌ম্যান* (প্রতিবিধায়ক), ২০০১]। কিন্তু সাম্প্রতিককালে দেশব্যাপী খাবার ও ঔষধে ভেজাল বিরোধী অভিযান অনেকটা ইসলামী প্রশাসনের আইনগত প্রতিষ্ঠান *আল-হিসবারই* প্রতিফলন বলা যায়।

দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ গঠনে আমাদের করণীয়

নিবন্ধের ১ম ও ২য় অংশের আলোচনা হতে একথা স্পষ্ট হয়েছে যে, দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে এক ধরণের সামাজিক আন্দোলন সৃষ্টি অত্যাবশ্যকীয় হয়ে পড়েছে। সামাজিক আন্দোলনের জন্য দরকার একটি প্রেরণাদায়ী আদর্শ। প্রশ্ন হতে পারে, এমন কি কোন দর্শন বা আদর্শ আমাদের সামনে আছে যা দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি বা জাতিকে উজ্জীবিত করতে সক্ষম ? আমাদের মাঝে সেই উজ্জীবনী শক্তি হচ্ছে ধর্মীয় দর্শন কেননা, *বিবিসি ওয়ার্ল্ড ট্রাস্ট* পরিচালিত এক সাম্প্রতিক জরিপের ফলাফলে দেখা যায়, বাংলাদেশের মানুষ সাধারণত ধর্মপ্রাণ। সারা দেশ হতে জরিপে অংশ গ্রহণকারী পাঁচ হাজার একশত বার জনের মধ্যে ৯৭ শতাংশই স্বীকার করেছেন যে, তাদের জীবনে ধর্ম খুবই গুরুত্বপূর্ণ (বিস্তারিত দেখুন *দৈনিক প্রথম আলো*, ১৬ নভেম্বর, ২০০৫) । দুর্নীতির উৎস হচ্ছে মানুষের মন-মজ্জাপ্রসূত প্রবণতা যা আপেক্ষিক। কিন্তু ধর্মীয় বিশ্বাস হচ্ছে শাশ্বত ও চিরস্থায়ী ! এর শিকড় মানুষের অন্তরের গভীরে প্রোথিত । মানবজাতির জীবন দর্শন ও পথ নির্দেশিকা এবং দুনিয়ার কল্যাণ ও পারলৌকিক মুক্তি সোপান পবিত্র *কুরআনে* মোমিন বা বিশ্বাসীদের উদ্দেশ্য করে ঘোষণা করা হয়েছে ঃ

*"তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত ! মানবজাতির (কল্যাণের) জন্য তোমাদের আবির্ভাব হইয়াছে; তোমরা সৎকার্যের নির্দেশ দান কর, অসৎকার্য নিষেধ কর এবং আল্লাহ্‌ তে বিশ্বাস কর (সুরা আল-ই-ইমরান,*৩ ঃ ১১০)।

উল্লেখিত আয়াতে অন্তর্নিহিত রয়েছে মানুষের জীবন দর্শন, কল্যাণকামী প্রেরণা ও দায়িত্ববোধের চেতনা। এই আয়াতের বাণী কারো হৃদয়ে ভালভাবে প্রোথিত করা সম্ভব হলে, তিনি শুধু দুর্নীতিমুক্ত হওয়া নন, একইসাথে পরিণত হতে পারেন একজন দুর্নীতি প্রতিরোধকারী হিসাবে। কেননা, *কুরআনের* নির্দেশ মান্য করা প্রত্যেক *মোমিনের জন্য ফরজ* বা অবশ্যই পালনীয়। কোনক্রমে *ফরজ* তরক করা *কবিরা গুনাহ্‌* যা ক্ষমাযোগ্য নয়। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশ্বনবী (সঃ) -এর একটি বহুল উদ্ধৃত হাদীস হচ্ছে ঃ

"যদি তোমাদের কেউ কোন অন্যায় বা পাপাচার অনুষ্ঠিত হতে দেখে, সে যেন তা হাত দ্বারা (শক্তি প্রয়োগে) অবশ্যই পরিবর্তন করে দেয়। যদি সে এরূপ করতে সক্ষম না হয়, তবে সে যেন ভাষার মাধ্যমে (আদেশ উপদেশ) তা পরিবর্তনের চেষ্টা করে। তাতেও যদি সে সক্ষম না হয়, তাহলে মন দ্বারা যেন তা পরিবর্তন কামনা করে। আর এটি হল ঈমানের দুর্বলতম পর্যায় (সহিহ মুসলিম)"

অতএব, প্রতিটি *মোমিন* বা বিশ্বাসীর ধর্মীয় কর্তব্য ও এবাদত হচ্ছে, দুর্নীতির মত ধর্ম ও জাতীয় স্বার্থবিরোধী কার্যকলাপ শুধু পরিহার নয়, বরং তা প্রতিহত করা। তাই সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী ও হেদায়তের গ্রন্থ *কুরআন* নাজিলের মাসই হতে পারে আমাদের সেই দায়িত্ব পালনের নতুন অভিযাত্রা। এজন্য প্রয়োজন রাষ্ট্রীয় পৃষ্টপোষকতা।

মালয়েশিয়ার ন্যায় আমাদের রাষ্ট্র ধর্ম ঘোষণা করা হয়েছে আল্লাহ্‌র মনোনীত *দ্বীন* ইসলাম। আমাদের রাষ্ট্র পরিচালনার মৌল নীতিমালার প্রথমেই উল্লেখিত হয়েছে "পরম করুণাময় আল্লাহর উপর আস্থা ও বিশ্বাস" [অনুচ্ছেদ-৮(১)]। বাংলাদেশে অভ্যন্তরীণভাবে রাষ্ট্রীয় প্রচার মাধ্যম ও পত্র-পত্রিকায় *"সৎকার্যের নির্দেশ ও অসৎকার্যের নিষেধ"* সম্পর্কিত *কুরআনের* বাণী ও সংশ্লিষ্ট *হাদীসের* বহুল প্রচার এবং এ বিষয়ে বিভিন্ন সেমিনার, *টক্‌শো* ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মানুষকে সচেতন ও উজ্জীবিত করার পাশাপাশি, বাহ্যিক চাপ (ঊঃবৎহধষ পযবপশ) সৃষ্টিকারী কিছু প্রতিষ্ঠান যেমন *অম্বুড্‌জ্‌ম্যান* নিয়োগ ও **স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশনকে** শক্তিশালীকরণ ইত্যাদি প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাও কার্যকর করা প্রয়োজন।

এছাড়াও মানুষকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে উজ্জীবিত করার ব্যাপারে কতিপয় আচরণবিধি প্রণয়ন ও কার্যকর করার ব্যাপারে নিম্নোক্ত তিনটি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে ঃ

প্রথমতঃ সমাজতত্ত্ববিদ, মনোবিজ্ঞানী ও ধর্মীয় বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে একটি **কমিটি গঠন** যা প্রশাসন ও রাজনীতিতে দুর্নীতি প্রবণতার কারণসমূহ চিহ্নিত করবে এবং এসবের প্রতিরোধে করণীয় বিষয়ে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়ন করবে ;

দ্বিতীয়তঃ দুর্নীতির প্রবণতা প্রতিরোধে প্রেরণাদীপ্ত কতিপয় **নৈতিক বিধিমালা প্রণয়ন** এবং তা জাতীয় কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণসূচীতে অন্তর্ভূক্তকরণ। উল্লেখ্য যে, North South University-Gi Ethics and Knowledge Club কর্তৃক সম্প্রতি অনুষ্ঠিত এক সেমিনারে দেশের বরেণ্য শিক্ষাবিদ, দার্শনিক ও চিন্তাবিদগণ দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ গঠনে দেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মূল পাঠ্যক্রমে *নৈতিকতা কোর্স* অন্তর্ভূক্ত করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন (দেখুন " Ethies in Corc Curricula can Curb Corruption " in *The Daily Star*, Dhaka মার্চ ১৯, ২০০৬) ; এবং

তৃতীয়তঃ দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রণীত **নীতিমালাসমূহ** সরকারী কর্মচারীদের আচরণে প্রতিফলিত হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা করা। এছাড়াও জাতীয় সামাজিক আন্দোলনের অংশ হিসাবে বাসে, ট্রেনে, শপিং সেন্টার, নাটক-সিনেমা, চিত্রকলা এবং অফিস-আদালতের সর্বত্রই উচ্চারিত হবে আমাদের শ্লোগান ঃ

ঘুষ নেব না
ঘুষ দেব না
কাউকে দুর্নীতি করতে দেবনা।

রাষ্ট্রের ও জনগণের সম্মিলিত উদ্যোগে আকাশচুম্বি সমস্যারও যে সহজ ও দ্রুত সমাধান সম্ভব, তার সাম্প্রতিক প্রমাণ হচ্ছে, 'নকলমুক্ত পরীক্ষা,' 'পলিথিনমুক্ত বাংলাদেশ' ও 'দূষিত বায়ুমুক্ত ঢাকা নগরী'। 'খাবার ও ঔষধে ভেজাল বিরোধী অভিযান'ও আমাদের জাতীয় জীবনে সফলতার নতুন সংযোজন। বিশ্বায়নের এই তীব্র প্রতিযোগিতার যুগে, আমরা অর্থাৎ বাংলাদেশীরা, দুর্নীতির কারণে এভাবে নিঃশেষ হয়ে যেতে পারিনা। আমাদের উজ্জীবনী সঙ্গীত হচ্ছে, "প্রথম বাংলাদেশ, আমার শেষ বাংলাদেশ"। আমাদের রয়েছে স্রষ্টা প্রদত্ত প্রাকৃতিক সম্পদ ও জাতিকে উজ্জীবিত করার শক্তিশালী আদর্শ। শুধু প্রয়োজন
সুচিন্তিত ও সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণের। পবিত্র *সিয়াম* সাধনার এবং *রহমত, বরকত* ও *মাগফিরাতের* পবিত্র রমজান মাসের *শবে কদরের* পরবর্তী দিনকে (পবিত্র *কুরআন* নাজিল হওয়ার দিন) **'ঘুষ ও দুর্নীতিমুক্ত দিবস'** ঘোষণার মাধ্যমে শুরু হউক আমাদের হাজার মাইল পদযাত্রার প্রথম পদক্ষেপ।